প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৮০

প্রকাশক

সুরজিৎ ঘোষ | প্রমা প্রকাশনী

৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ | কলকাতা-১৭

মুদ্রক

বিশ্বনাথ পাত্র | সত্যনারায়ণ প্রেস

১ রমাপ্রসাদ রায় লেন | কলকাতা-৬

পরমারাধ্য

৺চক্রধর গঙ্গোপাধ্যায়কে

এই কাব্যগ্রন্থের কালানুক্রমিক কবিতা সংকলনে বিন্যাসগত কিছু ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক বস্তুত নিজের বা নিজের কবিতার প্রতি এক প্রচ্ছন্ন উদাসীনতা যাঁর স্বভাবধর্ম তাঁর কাছে কালানুক্রমিক সাজান গোছান সংকলিত কবিতার পাণ্ডুলিপি প্রত্যাশা করা অনুচিত। তাই দুই দফায় খুঁজে পাওয়া কবির কবিতাগুচ্ছকে এই কাব্যগ্রন্থে 'কবিতা' ও 'এবং কবিতা' নামক দুটি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিয়তির অমোঘ পরিহাসে প্রকাশনার এই সময়টিতে কবি আমাদের মধ্যে নেই। তাই তাঁর কবিতাগুলি যেমন যেমন হাতে এসেছে ঠিক সেই ক্রমানুসারে কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ করা শ্রেয় বলে মনে হোল। বলাবাহুল্য সে কারণে কালানুক্রমিক কবিতা সংকলনের ক্ষেত্রে কবিতাগুলির ভাব বা গঠনগত বিবর্তনের পর্যালোচনা অর্থহীন। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্বাবধান থেকে আকস্মিক বঞ্চিত হওয়ায় কাব্যগ্রন্থে কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা রয়ে যেতে পারে। সে কারণে আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী। তবুও কবিতাগুলি পাঠককে ছুঁয়ে গেলে সেই হবে প্রচেষ্টার একমাত্র প্রাপ্তি এবং কবির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

কাব্যগ্রন্থটির সর্বাঙ্গসুন্দর উপস্থাপনায়, বিশেষ করে প্রুফ দেখার কাজে, শ্রীতাপস ভট্টাচার্যের সহযোগিতা অবশ্য স্মরণযোগ্য।

ভূমিকা

সদ্যপ্রয়াত কবি অমলপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থের মুদ্রিত রূপের ছ' সাত ফর্মা নিয়ে এসে কবিকন্যা শ্রীমতী শিপ্রা চট্টোপাধ্যায় আমাকে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লেখার কথা বলেন। অমলবাবু আমাদের বন্ধু ছিলেন, তিনি তাঁর চরিত্রমাধুর্যে সকল মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন। তিনি পুরুলিয়ায় ছিলেন, দেখা সাক্ষাৎ কম হতো, কিন্তু দেখা হলে অন্তরের উপলব্ধি হতো।

এই অমলবাবু পুরুলিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনের এক অনিবার্য প্রাণপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি যে এত সুন্দর কবিতা লিখতেন, তিনি কবিতাময় পুরুষ, কবিতার বোধ ও বোধিতে একাত্ম ছিলেন এমনভাবে তা কিন্তু জানতাম না। প্রায় পঞ্চাশ বছর আমি কবিতার কাগজ "একক" সম্পাদন করে আসছি, কখনো ত একটি কবিতাও পাঠানান প্রকাশের জন্যে, ফলে তাঁর কবিতার স্বাদ গ্রহণের সুযোগ ঘটেনি আগে।

অমলবাবু যে উঁচুজাতের কবি তা এই গ্রন্থই ঘোষণা করবে। ছন্দ এবং ভাষার ওপর দখল তাঁর অসামান্য। প্রকাশভঙ্গীটিও সম্পূর্ণ নিজস্ব। প্রকরণে যেমন তিনি নিজের এলাকায় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন, তেমনই তাঁর বিষয়বস্তু ও উজ্জীবতায় তিনি সম্পূর্ণ অভিনব।

এই কাব্যটি দু' ভাগে বিভক্ত। 'কবিতা' নামে একগুচ্ছ কবিতা, আর 'এবং কবিতা' নামে আর একগুচ্ছ কবিতা। উভয় ভাগের বেশীর ভাগ কবিতাই কিন্তু কবিতার কাছে কবির সমর্পণবিষয়ক। কবিতার ঋণ শোধ করতেই তিনি বদ্ধপরিকর। শেষ পর্বে তিনি মুক্তকণ্ঠেই ঘোষণা করেছেন—'প্রতিদিন/দু চার লাইন/এভাবেই আজীবন শুধে যাই কবিতার ঋণ।

দক্ষ প্রবীণ কবির মতোই অমলবাবু মাঝে মাঝে এমন গভীর কবিতা লিখেছেন—যা সচরাচর তুলনারহিত। 'অনন্ত জ্যোৎস্না'র নামের কবিতাটির কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, অপরিসীম গভীরতায় তাঁর কবিতা কখনো ডুব দিয়েছে। কবি লিখলেন—'এক হাতে নীলপদ্ম অন্য হাতে লাল/আশ্চর্য পায়ের কাছে ভেসে আছে মানসমরাল,/বুকে ঢাকা আনন্দ পূর্ণিমা/দুই চোখে অসম্ভব প্রেমের লাবণী,/একটি কি দুটি শব্দে বেজে ওঠে/কবিতার জন্মমৃত্যুধ্বনি,/পাই না কখনও খুঁজে রহস্যের সীমা/কবিতা লিখতে বসে তোমাকেই ভাবি/তোমার অনিন্দ্য মুখে দিব্য নাকছাবি।' অনন্তের মহিমা ও সৌন্দর্যে কবি যে সহজেই ডুব দিতে পারেন তা দেখা যায়। ১৩নং কবিতাটিও গভীরতার ইঙ্গিতবহ।

আজকাল বাংলা কাব্যে প্রায়শই দেখা যায় কবি নাটকীয় রসের ভিয়েনে উপসংহার টানেন,—তাতে কাব্যের ইঙ্গিত বাড়ে। অমলবাবুর লেখায় আমরা এই ধরনের পদ্ধতি দেখতে পাবো। 'কেয়া' কবিতার উপসংহারটি নাটকীয় রসে জারিত হওয়ায় পাঠকের মন অনস্বভূতপূর্ব ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

এই গ্রন্থে কবি স্মৃতিকে রোমন্থন করেছেন, নতুন ভাষা প্রয়োগে সেই স্মৃতি রোমন্থন পাঠকের কাছে কখনও বা ব্যক্তিক সংবেদনার ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। স্মৃতি-আতুর মনে কবি পূর্ববঙ্গের ছবিকে এমনই ব্যঞ্জনাধর্মী চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন—তা পাঠককে উন্মন করে তোলে। স্মৃতির ছবিতে এসেছে ঠাকুমার হাতের আদর, মায়ের কথা—সবই কবিতার সূত্র ধরেই উল্লিখিত হয়েছে, আর পাঠকের মন সেই স্মৃতি-আতুরতার উদাসীনতায় কেমন যেন অকারণে আকুল হয়।

এমন গুণের কবি হলেন প্রয়াত অমলপ্রসাদ। তাঁর গ্রন্থের ভূমিকা লেখার জন্যে এই কবিতাগুলি পড়ে আমি বিস্মিত হয়ে গেছি; তিনি মানুষটা কেমন সেই পরিচয় দিয়েই আমাদের সঙ্গে মিশেছেন, কিন্তু তিনি জাত কবি, তাঁর আসন যে কাব্যসরস্বতীর সভায় বেশ উঁচুর দিকে এ পরিচয় তো আমরা কখনো পাইনি। আজ আপশোষ হচ্ছে। তিনি নীরব সাধক ছিলেন, এখন তাঁর অবর্তমানে আমরা তাঁর সাধনার ধনকে কদর দেখাচ্ছি, জানি না দেশের লোক এই কবির রচনাকে কতদূর আদরণীয় মর্যাদায় ভূষিত করবেন, তবে তাঁর সাধনা যে যথার্থ সম্মানের সঙ্গে সাহিত্যে গ্রহণীয়—এ ঘোষণা করতে কোনো দ্বিধা নেই।

আজকাল সাহিত্য সাধনা কতকটা দৈনিক সংবাদপত্রকেন্দ্রিক, যথার্থ সাধনা, নিভৃত সাধনা, একক সাধনা—এসব প্রাচীন সংস্কার বলে সরিয়ে রাখা হয়েছে। তাই যাঁরা প্রকাশকুণ্ঠ, যাঁদের গোষ্ঠী নেই তাঁদেরকে আর সাহিত্যের বরপুত্র বলা হয় না—এ দুর্ভাগ্য কত অসহায় শিল্পীর—তার হিসাব নেবে কে? যাই হোক অমলপ্রসাদ নীরব সাধক ছিলেন, আজ তাঁর একটি বই প্রকাশিত হচ্ছে, এ পরম আনন্দের বিষয়।

সূচী

অনন্ত জ্যোৎস্নায় ১৭
ফেরা ১৮
চকমকি ১৯
নিজের মাঝে নিজেই আছি নির্বাসনে ২০
ভেসে যেতে দেখি ২১
হাজার মানুষের মধ্যে একটা মানুষ ২২
দিনেশ দাস ২৩
অগ্নিব্রত ২৪
ভয় কোরো না ২৫
আলোকে যতটা চিনি ২৬
পৃথিবীতে করেকটি হিমযুগ ২৭
প্রতীক্ষা ২৮
এক একটা সময় যখন বোবাও গান গাইতে চায় ২৯
চাইলেই পাবো এরকম শুনেছি সকালে ৩০
ভালো মানুষের সঙ্গে দেখা হলে মন ভালো হয় ৩১
একদিন বদলে দেবো ৩২
কে আছে? কে আছে? ৩৩
কেউ কেউ আশ্রয় চায় না ৩৪
সারাদিন চোখে চোখে কথা ৩৫
ঝড় উঠলেই স্বরলিপিতে বাঁধতে হবে মুঠো ৩৬
শুদ্র বিদ্রোহের আগুনে থেকে ব্রাহ্মণই জন্মাবে ৩৭
সুঁন্যার জন্য ৩৮
কেউ ভালো নেই এই বিপন্ন সময় ৩৯
যখন শিশুর মুখে নারী ৪০
যাদু মাদুর ৪১

এক একদিন ভোরে ঘুম ভাঙলেই ৪২
সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে বিক্ষত শরীর ৪৩
একটা দিনের ঘাট ছেড়ে গেলে সূর্যের জাহাজ ৪৪
এক একটা কবিতা পড়লেই ৪৫
মাথার মধ্যে ঘুণপোকা সেই সকাল থেকেই ৪৬
একবার দেখেছিলাম ৪৭
কিছুই পারিনি এবং কি করে যে ৪৮
কোনও প্রিয় নাম এই অজানা শহরে ৪৯
অনেক অনেক গান জীবনের ৫০
আমার এই ছোট দু'হাতে ৫১
আমি আছি এই নারা ৫২
পাহাড় বড় একলা থাকে ৫৩
শেষ ট্রেন ছেড়ে গেলে ৫৪
এপিটাফ ৫৫
কথা দেওয়া যতটা সহজ ৫৬
এ ঘরে এখন খুব আলো আছে ৫৭
অসুখ নিয়ে ৫৮
জীবন ৫৯
গন্ধরাজের গন্ধ কত কাল ৬০
সকাল হলেই কাগজ কলম নিয়ে ৬১
চারিদিকে মন্দ দেখে দেখেই ৬২
এবার আমার ছুটি ফুরিয়েছে ৬৩
বেঁচে থাকা ৬৪
বুকের মধ্যে রক্ত টগবগ ৬৭
আমারই আনন্দ নিয়ে ৬৮
অন্য কোনখানে ৬৯
এই দেখলে গুচ্ছ গুচ্ছ লাল গোলাপ ৭০
বুকের মলাটে তুমি ৭১
চিৎকার করে ডাকলেই ৭২

শহর কোলাহলের তীরে ৭৩
হাতে হাত ৭৪
একদিন তোমার কোল থেকে ৭৫
কোন এক কবির বাবার ৭৬
ভালবাসার মত সহজ কিছু নয় ৭৭
আজ পয়লা এপ্রিল ৭৮
গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে চলতে ৭৯
মানুষের মুখের দিকে চাইলেই ৮০
টুকলুর সঙ্গে বিকেলের ৮১
চিঠি ৮২
কলকাতাকে খুঁজতে আর ৮৩
আমার এখন সিঁড়ি ভাঙা বারণ ৮৪
বাতাস বলছে যাও ৮৫
চুপচাপ বসে আছো ৮৬
ভোরবেলায় খিড়কির দরজা খুলতেই ৮৭
তোমার বুকে হাত রাখলে ৮৮
আমি এখন কবিতা লিখব ৮৯
একটি কবিতা যদি কোথাও ৯০
বিলাপ রস ৯১
ছুটি ৯২
দু একটা তেমন কবিতা লিখতে পারলে ৯৩
প্রদীপের নিচেই যতো অন্ধকার ৯৪
সুন্দরের হাত ধরে সুন্দর ৯৫
দেরি হলেই বা কি ৯৬
গভীর চোখের কোন অনুবাদ নেই ৯৭
তোমার সঙ্গে আমি ৯৮
একটি নারীর জন্য যেভাবে ৯৯
তোমার কাছে বিদায় নিতে এসে ১০০
আমার সব কথা তোমাকে ১০১
ভোর হলে ১০২
যদি বলি খোলো ১০৩

তৃষ্ণা   ১০৪
প্রান্তর কাননে আমরা এক একটি ফুল   ১০৫
কাছে পিঠে কোথাও যে যাবো   ১০৬
দেখেছি নৌকোর মত নারী   ১০৭
কাছে এলেই ভালবাসবো   ১০৮
ভাবতো শরীর শুধু   ১০৯
মধ্য দিন   ১১০
সকাল থেকেই পাখীদের গান   ১১১
প্রতিদিন   ১১২

কবিতার জন্ম

ভালোবাসা ভালো ভাষা জুগিয়ে দেয় মুখে।
।ভালোবাসার কাব্য তখন আত্মায় উজবুকে ॥

কবিতা

এক

অনন্ত জ্যোৎস্নায়

আমার ঈশ্বর নেই
নেই মালা তুলসি, কবচ তাবিজ
কিংবা আংটি ও পাথর

আমি নিত্য ধাবমান তোমার সুন্দরের পানে
যেখানে রয়েছ ব'সে
এক হাতে নীলপদ্ম অন্য হাতে লাল
আশ্চর্য পায়ের কাছে
ভেসে আছে মানসমরাল,
বুকে ঢাকা আনন্দ পূর্ণিমা
দুই চোখে অসম্ভব প্রেমের লাবণী,
একটি কি দুটি শব্দে বেজে ওঠে
কবিতার জন্মমৃত্যুধ্বনি,
পাই না কখনও খুঁজে রহস্যের সীমা
কবিতা লিখতে ব'সে তোমাকেই ভাবি
তোমার অনিন্দ্য মুখে দিব্য নাকছাবি

দুই

ফেরা

কাল তোমার ঘরে গিয়েছিলাম—এখন ঘরের মতো ঘর
চোখেই পড়ে না আজকাল। সচরাচর
দেখা যায় সবই কি রকম ছন্নছাড়া এলোমেলো
অগোছালো আজকের জীবনেরই মতো। কে গেল, কে এলো
তা নিয়ে যেমন মাথাব্যথা নেই আজ কারও
ভেবেছিলাম ঠিক তেমনটি হবে তোমারও
পোড়া বিড়ি ছড়ানো মেঝেতে পা রেখে
ভ্যাপসাগন্ধ এড়াতে রুমালে নাক ঢেকে
আমিও নিজেকে ঠিক ঠিক খাপ খাইয়ে নেবো
তারপর প্রথামাফিক ছুটিয়ে আড্ডা দেবো
চায়ে, সিগারেটে, কবিতায়, প্রবন্ধে, ছোটগল্পে
কারণ আমরা কেউ-ই তো এখন তুষ্ট হই না অল্পে
কিন্তু সবই এলোমেলো ক'রে দিলো তোমারই ঐ ঘর
মনের মধ্যে বেজে উঠলো অন্য এক স্বর :
চকিত সময় পিছু হটল ভেঙে কালের বেড়া
এ যেন সেই শিশুকালের মায়ের কোলে ফেরা

তিন

চকমকি

সেই যে এক বাদল দিনে তোমার সঙ্গে দেখা
কেউ ছিলো না—তুমিই ছিলে একা
কাদায় নষ্ট হাওয়াই জোড়া দুলছিল একহাতে
বৃষ্টি বাদল শুধুই তো নয় ঝড়ও ছিল সাথে
তোমার ছাতা উল্টে গেল দমকা হাওয়ার তোড়ে
বড় হাটের মোড়ে
কেউ ছিলো না, কেউ দেখেনি, আমিই ছিলাম একা
তেমন ক'রে আর কখনও হয়নি তোমায় দেখা

চার

নিজের মাঝে নিজেই আছি নির্বাসনে
পাশেই তুমি ব'সে আছো আপন মনে
হাত বাড়ালেই রক্তে দোলা মাংসে খুশি
তারপরে কি তারপরে কি তারপরে কি

পাঁচ

ভেসে যেতে দেখি

যেখানে সমুদ্র নেই – নদীও না
সেইখানে আজন্মের মতো
জনস্রোত ভেসে যেতে দেখি
রাজপথে—এ সব নদীর মতো
সমুদ্রের মতো বিশালতা আনে না জীবনে।
চায়ের দোকানগুলি বন্দরের ঘাটের মতন
সময়ের জাহাজের থেকে গুটি কয় যাত্রী নেমে এলে
জমে ওঠে সকালে বিকেলে – বাকীটা সময়
নির্জনতা মাছির মতন ভনভন করে চেয়ারে টেবিলে।

যখন যৌবন আসে বুক ঠেলে
যখন মনের মধ্যে ভেসে আসে খড়কুটো
তখন শরীরে সব সমুদ্র ও নদী
মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে ঠিক
এবং সে ঢেউ বেণীর বাঁধনে বেঁধে
কিশোরীও পৌঁছে যায় যৌবনের ঘাটে

ছা পোষা কেরাণী হবার আগে দু'দিন তরুণ
নৌকো নদী নারী নিয়ে অনিদ্রায় ভোগে

ছয়

হাজার মানুষের মধ্যে একটা মানুষ
হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে বেরোয়
তার চুলের সঙ্গে মিতালি পাতায়
শ্রাবণ আকাশের মেঘ
দু'চোখে ঝিকমিক করে ওঠে অশ্বিনী ভরণী
সে হাত বাড়ালে সান্ত্বনা
মুখ ফেরালে অন্ধকার
আর সে জন্যই
ন'শো নিরানব্বুইটা বদমাশ
মানুষ নামে পার পেয়ে যায়

সাত

দিনেশ দাস

স্মৃতির অনেক রঙ

একদিন কাস্তের সঙ্গে চাঁদকে মিলিয়ে
একটি যুগ উপহার দিয়েছিলে তুমি
তের'শ পঞ্চাশের ভুখ মিছিলে
তুমিও ছিলে আমার পাশে কলকাতায়
ছিলে বাইশে শ্রাবণের শোকযাত্রায়

স্মৃতির অনেক রঙ
মৃত্যু তাকে ঘন করে আরও

আট

অগ্নিব্রত

দীর্ঘশীর্ণ সময়ের পাখি যখন ধুলোয় প'ড়ে পাখা ঝাপটায়
ট্রাফিক জ্যামের মতো থেমে যায় পথ, নেমে যায়
ট্রাম-বাস-বিহারী-পথিক, দূরে ইস্টিশানে লাল চোখ
হলুদ সবুজ হয়, ট্রেনের জানালা দিয়ে অবাক বালক
পলাতক পৃথিবীকে দেখে নেয়—মাকে মনে পড়ে—।
আমি যে কবিতা লিখি, আমি যে বিবর্ণ হই সময়ের ঝড়ে,
মাঝ রাতে পৃথিবীকে কোলে নিয়ে বসি বিছানায়—
কোটি কোটি বছরের সময়ের ঘুন যাকে কুরে কুরে খায়,
তবুও রৌদ্রের ঋতু শেষ হ'লে বর্ষা নামে অকুণ্ঠ ধারায়
ফাটা মাঠ ঢেকে দেয় আকস্মিক সবুজের চঞ্চল অঞ্চলে
যেমন রোমাঞ্চ জাগে শব্দের শরীরে একটি কবিতা লেখা হ'লে
আমি সেই পৃথিবীর সমান বয়েসী, নাকি পৃথিবীরই মতো
সূর্যের সন্তান আমি, শিরদাঁড়া বাঁকা তবু অগ্নিব্রত।

নয়

ভয় কোরো না
তোমার পাশের ঘরেই রয়েছেন
রাজা রামমোহন রায়
রামকৃষ্ণ পরমহংস
নটী বিনোদিনী
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মধুসূদন দত্ত
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নিউটন, ডারুইন, মার্কস,
আয়েনস্টাইন, লেনিন
শেক্সপীয়ার
চার্লি চ্যাপলিন

ভয় কোরো না মানুষ
মানুষের পাশেই রয়েছে মানুষ
মানুষ

দশ

আলোকে যতটা চিনি
তত্তটা চিনি না অন্ধকার
অন্ধকার একা একা
আমি তো তখন ঘুমঘোরে
মাঝে মাঝে লক্ষ বাতি জেলে দিই
স্বপ্নের উদ্যানে
তুমি পাশে থাকো আর না-ই থাকো
তোমার কান্নার চেয়ে তোমার হাসিই
ভ'রে থাকে আমার বিছানা

এপার

পৃথিবীতে কয়েকটি হিম যুগ
এবং হিম যুগগুলির মাঝে মাঝে
কয়েকটি উষ্ণ যুগ এসেছে
আমরা এখন একটি উষ্ণ যুগে
বাস করতে করতে
হিম হয়ে যাচ্ছি
তোমার নাম হিমানী হ'লে
আমার নাম অনল হবে
এ রকমই কথা ছিল
তোমার নাম অগ্নি হ'লে
আমার নাম তুষার হবে
এ রকমই কথা ছিল
কিন্তু আমাদের চারপাশে
জলবায়ু ক্রমেই ঠান্ডা আর আর্দ্র হয়ে উঠলো
যদিও আকাশে সূর্য বসন্তকাল মাড়িয়ে
গ্রীষ্মকালের দিকে ছুটেছে আগুন ছড়াতে ছড়াতে
আমরা ভেতরে ভেতরে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছি
আমাদের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে,
আমরা বউ পুড়িয়ে আগুন পোহাতে চাইছি
আমরা গ্রাম পুড়িয়ে আগুন পোহাতে চাইছি
আমরা অ্যাটম বোমার দিকে হাত বাড়িয়েছি
আমাদের অন্তর্গত আত্মনাশের গোপন লিপ্সা
আমাদের জমিয়ে জমিয়ে বরফ করে দিচ্ছে

প্রমিথিউস তুমি কতদূরে ?

বার

প্রতীক্ষা

হলুদ গোলাপ নিয়ে ব'সে আছি সোনালি বিকেলে
বসন্তের ধ্যানে
কান পেতে আছি পথে
দরোজায় চোখ
যে আছে বুকের মধ্যে অহর্নিশ
ফুলতোলা নাম হয়ে রুমালের কোণে
রয়েছে পকেটে
তার জন্য প্রতীক্ষায় থাকা
এর চেয়ে আর কি মদির

তের

এক একটা সময় আসে যখন বোবাও গান গাইতে চায়
এক একটা সময় আসে যখন অন্ধও দেখতে পায়
আর ঠিক সেই সময়েই
আর ঠিক সেই সুযোগেই
মহাত্মারা তাদের ভুল পথে নিয়ে যান
দেশ ভাগ হয়ে যায়
মন ভাগ হয়ে যায়
দেশ জুড়ে নামে বোবা অন্ধকার

চোদ্দ

চাইলেই পাবো এ রকম শুনেছি সকালে
চাইলেই পাবো এ রকম শুনেছি দুপুরে
এ রকম শুনে শুনে পৌঁছেছি বিকেলে
এখনও তো এলোচুলে বসে আছো তুমি
খুকি-বিনুনীর সুখ করবে কখন।

পনের

ভালো মানুষের সঙ্গে দেখা হলে মন ভালো হয়
এই কথা শুনে হা হা হেসে উঠেছিলো জানালা কপাট
ছুটে এসেছিলো বসন্ত বাতাস বনগন্ধময়
এ ভাবেই বুঝি তার বুকের আঁচল উড়ে গিয়েছিল
ভালো মানুষের সঙ্গে দেখা হ'লে এভাবেই হয়

ষোল

একদিন বদলে দেবো
খবরের কাগজের হেডলাইন
ছুচ ও আলপিনদের তুমুলে লড়িয়ে দেবো
মশা ও ছারপোকাদের সঙ্গে
তারপর গোডকে ডিংয়ের অন্ধকারে বসে
হো হো হাসি
ভূতের মতো ॥

সত্তর

কে আছে ?   কে আছে ??
কার কাছে সব বলা যায় ?

কথা কি ফুরায় !

আঠার

কেউ কেউ আশ্রয় চায় না—ছুটে যায় ধু ধু মরুর বিস্তারে
তুমি তার জন্যও নিকোনো উঠানে আঁচল পেতে রাখো
মাঝ রাতে চাঁদ উঠে দ্যাখে
তোমার দু'চোখে চিক চিক করছে জল

উনিশ

সারাদিন চোখে চোখে কথা
সারারাত শিহরণ
জীবন জীবন

ঝুঁকি

ঝড় উঠলেই স্বরলিপিতে বাঁধতে হবে মুঠো
আমি খাতা পেন্সিল নিয়ে তৈরী থাকি

মা-কে ডাকলে শৈশব রনরন করে ওঠে
গভীর তানপুরায়
ঝড় ডাকলে সারা দেশের বুকের মধ্যে যাই
মাদল থেকে, শ্রীখোল থেকে, ধামসা থেকে, বল্লু থেকে
সুরের মাতন ঝড়ের বুকে জাগলে আমি তৈরী হই
তৈরী হতে থাকি

একুশ

শূদ্র বিদ্রোহের আগুনে থেকে ব্রাহ্মণই জন্মাবে
কারণ ব্রাহ্মণই অগ্নি কিংবা অগ্নিই ব্রাহ্মণ
এ কথা জানতো না তারা
তাই বিদ্রোহটি ঘটিয়ে দিয়ে
এখন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে
চিড়িয়াখানার পাশে
পাঁচতারা হোটেলটির দিকে

বাইশ

রঁল্যার জন্য

এক এক সময় নীরবতাই এক ধরনের কাজ
দেখবেন—চারিদিকের বিরাট হট্টগোলের মধ্যে
একজন ব'সে আছেন নীরব নিস্তব্ধ

তারপর সবাই যখন ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, নিরাশ
তখন তিনি ওঠেন, মুখ খোলেন, বলেন :
ওঠো, জাগো

তেইশ

কেউ ভালো নেই এই বিপন্ন সময়ে—এই কথা ভাবতেই
চোখের সামনে ভেসে উঠলো তোমার হাসি হাসি মুখ
কি অপার দক্ষতায় হাসির আড়ালে তুমি কান্না ঢেকে রাখো
নইলে কবেই
থেমে যেতো
কবিতা ও গান

চব্বিশ

যখন শিশুর মুখে নারী
ভারী স্তন গুঁজে দেয়
পুরুষ তাকিয়ে থাকে, নারীও তাকায় তার দিকে
সব যেন কি রকম গতানুগতিক
পৃথিবীর ম্লানমঞ্চে অভিনয় করে যায় জন্ম জন্মান্তর
দৃশ্যান্তরে গেলে
ম্যাডোনার দাম কিন্তু স্থির আজও
ছবির বাজারে

পঁচিশ

যাদুমাদুর

আমার এ আধুনিক ঘরে বেমানান···তবু···তবুও
কেমন গোটান আছে নির্বিবাদে প্রাচীন মাদুর
যেন ভালোবাসাগুলি অতীত কালের
কাঠিতে কাঠিতে বোনা আছে
আশ্চর্য নিপুণ কাজ সে যুগের শিল্পীর হাতের
ঠাকুমাকে মনে পড়ে
নদী নৌকো মাঠঘাট সুপারির বন পার হয়ে
নিকানো উঠোনে (পটভূমিকায় প্রজ্জ্বলিত সেকালের ভাদ্রের সবুজ)
মাথাভরা কাশশুভ্র পরিপাটি চুলে
বাল্যের অন্যান্য সব স্মৃতি ঝাপসা হ'য়ে এলেও ক্রমশ
মহীয়সী সেই মহিলার মুখ এখনও উজ্জ্বল স্মৃতিপটে
যেন ঐ প্রাচীন মাদুরে কিছু কিছু গোটান রয়েছে

এখানে নগরে এই তেতলার ফ্ল্যাটে বেমানান
তবু বড় ভালো লাগে
মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে রাতে মনে হয়
একদিন ও মাদুর বিছিয়ে আবার শরীর এলিয়ে দিলে
সব ক্লান্তি দূরে গিয়ে ঘুম এসে মুছে দিলে
আজকের জীবনের যন্ত্রণার তাপ
আবার মানুষ হয়ে হয়তো ভাঙবে ঘুম আগামী সকালে

ছাবিবশ

এক এক দিন ভোরে ঘুম ভাঙলেই
দারুণ ভালো লাগে আমার
পলেস্তারা খসা দেওয়ালে মাকড়সার জাল
মেঝে ভর্তি ধুলো
কিছুই চোখে পড়ে না
জানালার ওপারে ভাঙা দেওয়ালের গায়ে
গজিয়ে ওঠা আগাছার ডালে
একটি ফুল
সারাটা দিন আমার খুশির সঙ্গে দুলতে থাকে

সাতাশ

সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে বিক্ষত শরীর
যখন ফেলে দিই নরম বিছানায়
মনে হয় রাত্রির মতন বন্ধু মানুষের আর কেউ নয়
মাঝরাতে ঘুম ভেঙে জানালায় চেয়ে দেখি
জেগে আছে চাঁদ
মনে হয় চাঁদের মতন বন্ধু মানুষের আর কেউ নয়
চাঁদ তারা ঘাস ফুল—এত বন্ধু তবুও মানুষ
শ্রাবণ সন্ধ্যায় ভেজা ফুটপাথে
চেনা পথ সহসা হারায়

আটাশ

একটি দিনের ঘাট ছেড়ে গেলে সূর্যের জাহাজ
আর একটি দিনের জন্য কান্না পেতে দাওয়াতেই শুই
বৈরাগীর গানে সন্ধ্যা কেঁপে কেঁপে রাতের গভীরে
শুতে যায় বনানী-নিবিড় কোন ছায়া অন্ধকারে
এভাবেই খেলে যাই স্বপ্ন-নিশি যাপনের খেলা
জোনাকীর সাথে ক্রমে জমে ওঠে নিবিড় সখ্যতা
মাঝরাতে চিরন্তন শৃগালের প্রহর ঘোষণা
থেমে গেলে পর স্তব্ধ নীরবতা বুকে চেপে বসে

সমস্ত দিনের কাজ হাড় ভাঙা খাটুনির শেষ
তার সঙ্গে মিশে থাকে জীবনের অন্তরঙ্গ গান
বিষাদের থেকে উত্তরণে মানুষ কি অমৃতের দিকে যায়
যেতে চায় ? পারে ? না কি সবই মহৎ সাহিত্য গাথা
মানুষেরই মন গড়া ? এই সব সাত-পাঁচ ভেবে
কতবার বেলা গেল, হাওয়া দিলো মন ভুলানিয়া

উনত্রিশ

এক একটা কবিতা পড়লেই
বুকের মধ্যে ঠেলে ওঠে আরব সাগরের ঢেউ
ভেসে ওঠে সিন্দবাদের জাহাজ
বন্দরে বন্দরে নেচে ওঠে রূপসী নর্তকী
যেমন আয়নার সামনে দাঁড়ালেই
চমকে উঠতে হয়
নিজেকে মানুষ বলে চিনতে পেরে
মুখ লুকোবার আর ঠাঁই থাকে না।

ত্রিশ

মাথার মধ্যে ঘুণপোকা সেই সকাল থেকে—
সোনারুপোর মাঝখানে কোন বাজারে যাই ?
শাঁখের করাত পায়ের কড়ি কে খসাবে বল্ ?
পানের থেকে চুন কিংবা হীরের থেকে জিরে
হিসেব নিয়ে হট্টগোলের পাওনা কড়া গণ্ডা
চুকিয়ে দেবার দায় ছিল কি জন্মজাতের দেনা ?
সে-গুড়ে কবে লেগে গেছে লাল পিঁপড়ের ভোজে ।
চাঁপা-পলাশ যতই করিস্ দস্তখতের খাতায়
সাপের ওঝা হার মেনেছে, তন্ত্রমন্ত্র মিছে
স্তনের বোঁটা কামড়ে ধরে দাঁত না ওঠা মাড়ি,
ঠাকুমায়ের সোনার সুতোয় খলবলিয়ে মাকু
পাছাপেড়ের বদল বানায় কস্তাপাড়ের শাড়ি ;
অঙ্গে চর্ম সার করেছি মিছাই কাপড়জামা
মাথার মধ্যে ঘুণ পোকারাই বাজাচ্ছে দামামা

একত্রিশ

একবার দেখেছিলাম
পাড়াগাঁয়ের খড়ের ঘরে
নিকোনো মাটির দাওয়ায়
এক থালা ধোঁয়া ওঠা ভাত মাঝে রেখে
মুখোমুখি কৃষাণ-কৃষাণী

এর চেয়ে বড়ো প্রেমচ্ছবি
পিকাসো পাবে নি

বত্রিশ

কিছুই পারোনি তবু কী করে যে এত বেশী পূর্ণ হ'য়ে আছো
যার সঙ্গে ভালোবাসা নেই
তার সঙ্গে সারারাত শুয়ে থাকো নিবিড় আশ্লেষে

তোমার শিশুরা তবু হয় না বেজন্মা কোন দিন

তেত্রিশ

কোনও প্রিয়নাম এই অজানা শহরে

ইস্টিশান থেকে নেমে
জনাকীর্ণ পথের দু'ধারে
প্রতিটি বাড়ীতে থেমে মনে হয়,—
কড়া নেড়ে ডাকি ঘরে ঘরে
সেই প্রিয়নাম ধরে যা আমাকে এখানে এনেছে

তুমি কি আমাকে চেনো ?
শুধালাম সেলুনের আয়নায় আমারই ছায়াকে :
দাড়ি কামাবার পরে
বেশ সাফ সুতরোই হয়েছে তখন
আমার নির্বোধ মুখচোখ
বয়সও পিছিয়ে গেছে দু'চার বছর
এখন আমারই নাম
সেই প্রিয় নাম হ'য়ে এই অজানা শহরে
আমাকেই ডাকে ঘরে ঘরে।

চৌত্রিশ

অনেক অনেক গান জীবনের
তেমন বেজে না সুরে,
ঠিকমতো সঙ্গত মেলে না
দুঃখের ঘুরোটি তবু তার
মায়াবী নেশার মতো
রক্তে মিশে থাকে।
আমি কি চেয়েছি আমি নিজেই জানি না
তবু তুমি অগোচরে তোমারই খানিক
রেখে গেলে বেদনার পেয়ালায় ভ'রে।
আমি তো জানিই
হয়তো বা জেনেছো তুমিও
বেদনার কাছে আমরা সবাই
কতোখানি ঋণী।

পঁয়ত্রিশ

আমার এই ছোট্ট দু'হাতে আর কত ধরবে দুঃখ শোক
আনন্দ আলোক
সন্তোষ অসন্তোষ বন্ধু ও শত্রু
শীতের ঠোঁট ফাটানো বাতাস আটকে
তোমার নরম বুকের স্বর্গীয় উত্তাপ
আর কতো ধরবে আমার ছোট্ট এই দু'হাতে

সফলতা অথবা ব্যর্থতা
ভালোবাসা এবং ক্রূরতা
আমি জানি সবই আমার এই দু'হাতে

অথচ বিপদ এলে সর্বাগ্রে আমার হাত দুটোকেই
এগিয়ে দিই আমি

ছত্রিশ

আমি আছি এই মায়া
তুমি আছো এই মোহ
কিছুই অসত্য নয়
যতোক্ষণ এই থাকা
সব দীপ্ত
সব জ্যোতির্ময়

সাঁইত্রিশ

পাহাড় বড়ো একলা থাকে

নদীর কেবল পালাই পালাই
সাগরে যাই সাগরে যাই

ঊষর পাহাড় ধূসর পাহাড়
পাহাড় বড়ো একলা থাকে।

আটত্রিশ

শেষ ট্রেন ছেড়ে গেলে

একটি কবিতা লেখা হলে
চিরচেনা ঘরটিকে নতুন দেখায়
একটি কবিতা পড়া হ'লে
স্মৃতি বড়ো তোলপাড় হয়

জীবন মৃত্যুর হাতে খেলার পুতুল
মানুষের সাধ হয় দেবতার সারিতে বসার
—দেবীদের যৌবন অজর
মানুষের মদালসা পাষাণ প্রতিমা
বুকে বড়ো চাপ দেয়

যদিও আমরা জানি জীবনের সবটুকু রস
আমাদেরই পেয়
তবুও পেয়ালা হাতে নিয়ে
সোফায় জমাট ব'সে পাশাপাশি আমরা দু'জন
দু'জনের থেকে দূরে চলে যাই

শেষ ট্রেন ছেড়ে গেলে দূরের স্টেশনে
অভ্যাসবশত তবু রুমাল উড়াই

ঊনচল্লিশ

এপিটাফ

কিশোরী মায়ের স্তনের মতো শরৎ এলেই
কী আশ্চর্য—আমরা সবাই কলকাতা ছেড়ে
মনে মনে চলে যাই পাহাড়ে সমুদ্রে
প্রেমিকের মতো একা আমরা সবাই
টিকিট ঘরের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে একা একা
ছাড়পত্রের আশায় থাকি

কিন্তু কোথাও কি কেউ গেছে কখনও কলকাতা ছেড়ে
আমরা সবাই জানি নিমতলা কেওড়াতলা
কী ভীষণ হোমসিক করে।

চল্লিশ

কথা দেওয়া যতটা সহজ

কথা রাখা ততটা সহজ নয়

তুমি বলেছিলে, আসবে

আসতে পারোনি

আমি বলেছিলাম, যাবো

যেতে পারিনি

মানুষের যাওয়া আসা ঋতুর মতন

সহজ তো নয়

তায় পদে পদে বাধা

তবুও সে কথা না রাখার বেদনায় বিদ্ধ হয়

রক্ত ঝরে বুকের গভীরে

ব্যথা পেতে জেনেছে বলেই এখনও মানুষ

কবিতায় কান পাতে

রক্তদান শিবিরেও যায়।

একচল্লিশ

এ ঘরে এখন খুব আলো আছে
মন থেকে অন্ধকার মুছে ফেলবার এই আয়োজন
মেয়েলী হাতের মত মায়ের মতন
বিছানাটা এক কোণে একাই ঘুমিয়ে
এ সব দৃশ্যের মাঝে নিজেকে কেমন
আগন্তুক মনে হয়
জানালার বাইরে ফুল গাছটিতে এত ফুল
দেখে আমি স্তব্ধ হয়ে যাই
আমি তো ওদের জন্য কিছুই করিনি।

বেয়াল্লিশ

অসুখ নিয়ে

সবাই বলছে আমার অসুখ
আমি তো দেখছি
রোজ ভোরে উঠছে সোনালী সূর্য আকাশ রাঙিয়ে

সবাই যখন বড় বড় নোট ভাঙিয়ে ওষুধ কিনছে
গোছা গোছা নোট তুলে দিচ্ছে ডাক্তারের হাতে
আমি দেখছি
পদ্মপাতায় জলের ফোঁটা শুষে নিচ্ছে
সূর্যের আলো

অসুখ কী? অবিশ্বাসীর কাছে
সারা জীবনই তো
একটা দীর্ঘস্থায়ী অসুখ
তাই যদি মেনে নেবো তা হ'লে আর মানুষ কি!

তেতাল্লিশ

'জীবন'

জানালার বাইরে সারারাত জেগে থাকে
ফুল গাছ
ঘরের ভেতরে অ্যাকুরিয়ামে জেগে থাকে
নীল মাছ
জেগে থাকবার জন্য আয়োজনের অন্ত নেই
তবু দূরগামী ট্রেনে মাঝরাতে এ ওর ঘাড়ে ঢলে পড়বেই
এই যাত্রা, খণ্ডিত বিশ্রাম
জীবনেরই অন্য এক নাম।

চুয়াল্লিশ

গন্ধরাজের গন্ধ কতকাল এ ঘরে আসে না
ধুলো ঢাকা প'ড়ে আছে লুপ্ত ফুলদানি
বহুদিন আমিও তো এ ঘরে আসি না
সারাদিন কোথা দিয়ে যায়! সারা রাত!

পঁয়তাল্লিশ

সকাল হলেই কাগজ কলম নিয়ে বসি
ডুব দিই মনের গভীরে
কিছুই ছুঁতে পারি না
এই আমি—এতটুকু মানুষ
তারই মনের মধ্যে এক বিশাল পৃথিবী
যার একভাগ স্মৃতি তিনভাগ বিস্মরণ
বিস্মরণের অতল সমুদ্রে
এখানে ওখানে স্মৃতি দ্বীপের মতন
মাথা তুলে আছে
তার কোনটার মাথায় প্রথম সূর্যের আলোর
কনক কিরীট
কোনটার মাথায় সঘন শ্রাবণের কালো মেঘ
স্তম্ভিত হ'য়ে বসে থাকি
কিছুই ছুঁতে পারি না
ছুঁতে পারি না
খোলা খাতার সামনে চুপ করে বসে থাকি
অসহায়
এইভাবে একদিন কবিও ফুরায়।

তেত্রিশ

চারিদিকে মন্দ দেখে দেখে আমি এখন ভালোর দিকে মুখ ফেরাই
ছেলেটি ভালো, মেয়েটি ভালো—শুনলে আকাশ থেকে সুখ ঝরে
মনেই পড়ে না পরিবেশ দূষণের কথা।

পৃথিবীর জন্মদিনের সমুদ্রের বিশৃঙ্খলতা নিয়ে
ছেলেটি আমার দিকে তাকালে
আমি প্রাণের কথা ভুলে যাই।
তার হাতে কোন পতাকা তুলে দিতে ইচ্ছে করে না।
আড়ালে আমার বন্ধুরা আমাকে প্রতিক্রিয়াশীল ব'লে,
হাসাহাসি করে—জানি
তবু আমি সুঠাম মেয়েটিকে মিছিলে না গিয়ে
নাচের ইস্কুলেই যেতে বলি।

সাতচল্লিশ

এবার আমার ছুটি ফুরিয়েছে। পশ্চিমের দিন শেষ
হাওয়া বদলের শেষে আবার আমাকে সেই পুরানো জুতো
ফিতে বেঁধে নিতে হবে। হাওয়াই চপ্পল আর পোঁছাবে না
রুটিন গন্তব্যে।
আমি হীন এই পশ্চিমেই তখনও আশ্চর্য সব ফুল ঝরে যাবে

আটচল্লিশ

'বেঁচে থাকা'

ভ্রমণ ফুরালে তবু ভ্রমণের নেশা থেকে যায়
ছেলেরা পাহাড়ে গেলে, আমি চুপচাপ ঘরে বসে থাকি
ঘর পাহারায় - মনেও ক'রো না ।

আমিও তাদের সঙ্গে চলে যাই পাহাড় চূড়ায় ।
ছেলেরা ফিরলে কত উজ্জ্বল কথার ঢল নামে,
আমি চুপ করে থাকি—সবই তো আমার জানা
ওরা শুধু সে কথা জানে না ।

শরীর বয়স মানে   মন তা মানে না,
ছুটে যায় পাহাড় চূড়ায়
অথবা সমুদ্রতটে দু'হাতে কুড়ায়
বিচিত্র ঝিনুক,
যতদিন বেঁচে থাকি মন দিয়ে ভোগ করি -
বেঁচে থাকবার সুখ ।

এবং কবিতা

এক

বুকের মধ্যে রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে
কলম ছুঁতে ইচ্ছে করে না—,
মানুষের জন্মের মতো সহজ নয় কবিতার জন্ম
মানুষের মতো যে কোন নার্সিং হোমে কবিতা জন্মায় না
হয়তো আজীবন একজন কবিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে
একটি কবিতা জন্মায়
একজন কবির সমাধি ফলকে ।

দুই

আমারই আনন্দ নিয়ে গড়ে ওঠা আর এক শরীরে
জীবন পটুয়া তার কারুকাজ
কি আশ্চর্য গড়ে তোলে
কিছুই যায় না দেখা বিছানার বিস্তীর্ণ আঁধারে
তবুও কি অনায়াস আনাগোনা
যামিনী রায়ের।

তিন

অন্য কোনখানে

শিশুর মুখের মতো স্তন থেকে স্তনান্তরে
এভাবেই ভালোলাগা
                    স্থান বদলায়
শিরদাঁড়া বেঁকে গেলে ছুঁড় খোঁজে মানব হৃদয়
কুকুর তাড়ানো নয়
            নিজেরই দাঁড়ানো নিয়ে সমস্যা তখন
কোমরে হাঁটুতে এবং চোখে ছানি পড়ে
অমল জ্যোৎস্নার রাত খুঁজে আন
                কে তখন হুড়োহুড়ি করে
অন্য রাত সামনেই থাবা পেতে বসে

চার

এই দেখলে গন্ধে গন্ধে লাল গোলাপ আগুন ছড়াচ্ছে
তার পরেই স্নিগ্ধ চন্দ্রমল্লিকা
দেখতে দেখতে ঝরা শিউলি মাড়িয়ে
কোথায় পৌঁছাবে তুমি জানো না।

যেমন অনেকে জানে না।
কবিতারও আছে শীতবসন্ত

পাঁচ

বুকের মলাটে তুমি ছবি এঁকে রাখো
বুকের ভেতরে সেই হাড় মাংস পাঁজরার স্তূপ
প্রেমিক ও জহ্লাদ একাকার

বুকের মলাটে তবু ছবি এঁকে রাখো

ছয়

চিৎকার করে ডাকলেই কি সাড়া পাওয়া যায়
গলার জোরে কি কিছু হয়
অনুভবের কি ভাষা আছে

কত সাধনায় মানুষের গলার স্বর নম্র হয়

সাত

শহর কোলাহলের তীরে কুণ্ঠিত দুই চোখ
বাসের ভীড়ে ঘামের গন্ধ মাখা
ট্রামের মাথায় কালো তারে বিচ্ছুরিত আলো
পায়ের তলায় বিশ্বভ্রমণ
ছেঁড়া জুতোয় ঢাকা

আট

হাতে হাত
কথাটা প্রথম রসবোধের দিন থেকেই
শুনে শুনে
অলৌকিক

তারপর সত্যিই যেদিন হাতে হাত
মুখে আর রা নেই

কোথা গেল চম্পক অঙ্গুলি

নয়

একদিন তোমার কোল থেকে
গড়িয়ে পড়েছিল লাল উলের বল
তোমার পায়ের কাছে ঘুমন্ত কালো কুকুরটা
উঠে দাঁড়াতেই
তুমি ধমক দিয়েছিলে
কুকুরটা আবার শুয়ে পড়েছিলো
তোমার স্বর্ণবরণ পায়ের কাছে
সেই থেকে কি যে হোলো
কোল থেকে গড়িয়ে পড়া লাল উলের বল
আর পায়ের কাছে ঘুমন্ত কালো কুকুর ছাড়া
তোমাকে ভাবতে পারি না

রক্ত

কোন এক কবির বাবার রাস্তা পিসেমশায়ের

পাখির পালক জমানোর শখ ছিলো

সুতরাং সেই কবির পক্ষে সম্ভব ছিলো

কলম ধরলেই আপনি ঠিক যেমনটি চান

তেমন কবিতা লেখার

আর এখনকার সব কবিদের

বাবাদের রাস্তা পিসেমশাইদের

চাষের ক্ষেতে বছরের পর বছর অজন্মা

দুর্ভিক্ষের সঙ্গে মোকাবিলা করতে করতে ক্ষয়কাশ

ডাক্তারহীন হেলথসেন্টার থেকে ওষুধহীন ফিরে আসা

তাই এখনকার কবিদের কবিতায়

মাঝে মাঝে

তাজা রক্তের ঝলক

তারপরই সব সুনসান

এগারো

ভালোবাসার মতো সহজ কিছু নয়
ভালোবাসার জন্যই মানুষ নিজেকে ভেঙেছে
ভালোবাসার জন্যই মানুষ
অর্ধনারীশ্বর

তোমরা ভালোবাসাকে ভেঙো না

বারো

আজ পয়লা এপ্রিল
কেউ কি বোকা বানাবে এই বুড়োকে !

শেষে কবিতাই বোকা বানালো
ধরা দিলো না সারাদিন

তেরো

গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে চলতে আটকে যাই

চিঠির বিন্যাসে

কালের জলে মুছে যাওয়া অক্ষরগুলির গায়ে

সন্তর্পণে হাত বুলোই

আঙুলের নখ বাড়তে থাকে আপন নিয়মে

এভাবেই সাজিয়ে রাখি

ছেলেবেলার স্বপ্ন ও ফিতে ছেঁড়া স্যাণ্ডেল

চোদ্দ

মানুষের মুখের দিকে চাইলেই
পৃথিবীকে ভালোবাসতে ইচ্ছে হয়
ভাঙা তোবড়ানো গালে
সারাটা জীবন থাপ্পড় খাওয়ার কালসিটে
তবুও মানুষ
বুকটান হেঁটে যায়
অনন্তের দিকে

পনেরো

টুকলুর সঙ্গে বিকেলের পার্ক, আলো,

লোকজনের ভীড়

সুন্দর মানিয়ে যায়

পার্কের বাইরে দাঁড়িয়ে

টুকলুকে দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক আমি

চমকে উঠি এক পথচারীর হঠাৎ হাসিতে

এক মন-কেমন-করা-হাসি

জীবনে শুনিনি

ষোল

চিঠি

সাদা কাগজের সামনে বসলেই দূরত্ব কমে যায়
কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে রেল স্টেশনের বিমান বন্দর
চিঠিগুলো লেখা শেষ হবার আগেই পৌঁছে যায়
ঘরে ঘরে দেশে দেশে
এখন পৃথিবী খুব ছোট হয়ে হাতের মুঠোয়
তবুও হয়না দেখা মানুষে মানুষে কতকাল
তাই রোদে পিঠ দিয়ে বসা
তাই চিঠি লেখা

সতেরো

কলকাতাকে খুঁজতে আর ভাল্লাগে না
মনে হয় ঘরে ফিরে যাই
যে-ঘর কোথাও নেই আর
সেই ঘর সে-মায়ের কোল

আঠেরো

আমার এখন সিঁড়ি ভাঙা বারণ
আমার এখন বেশী হাওয়া খাওয়া বারণ
আমার এখন বেশী কথা বলা বারণ
আমার এখন
আমার এখন
কবিতা লেখার সময়

ঊনিশ

বাতাস বলছে, যাও

বাগানে ফুল

মৌমাছিকে

নাড়ছে মাথা,

যা-ও

তোমার দিকে হাত বাড়াতে

সুখের মতো দুলতে দুলতে

কাঁধ ঝাঁকিয়ে

নাড়লে মাথা,

যা-ও

ছবি

চুপচাপ বসে আছো
তবু স্রোতস্বিনী

দু'পাড়ে গাঁয়ের ঘাটে ভীড়

একলা ঘাটে স্নানার্থিনী
চুপচাপ
বসে আছো
একা
তবু স্রোতস্বিনী

একুশ

ভোরবেলা খিড়কির দরজা খুলেই পুকুর। ওপারে মাঠ।
কেউ ওঠার আগেই জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াই,
ফিসফিস করে ডাকি, "সোনামণি," "সোনামণি",
অমনি জলের তলায় ঝিকমিক করে ওঠে
পোষা মাছের নাকে পরানো নোলক। অভ্যাস বশে
বাসি রুটির টুকরো ছুড়ে দিতে দিতে ওকে বলি,
"অতল জলের খবর বলো।"—শুনেই সে মাছ
হেসে ওঠে। আমি স্পষ্ট শুনতে পাই। শুনে
অবাক হই না। এ হাসি কেবল আমারই জন্য।
এ হাসি আর কেউ শুনতে পায় না। আমিও
বলিনা আর কাউকে এ হাসির কথা। শুধু
সারাদিনমান এই হাসি কানে নিয়ে আমি
ওপাড়ার ফুলিদের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকি।
ফুলিও হাসে। খালি খালি হাসে। সে হাসিও
আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না। আর
দেখতে দেখতে ফুলি বড় হতে হতে কেমন যেন
পালটে যায়। আমি তাদের দাওয়ার দাঁড়িয়েই
থাকি। রোজ ভোরে সোনামণিকে বাসি রুটির টুকরো
দিই। ফুলিকে কি দেব? জানি না। তাই মনে মনে
বলি,—"ফুলি তুমি আমাকে নাও, আমাকে নাও।"

বাইশ

তোমার বুকে হাত রাখলে
নিজেকে ঈশ্বরের মতো পবিত্র মনে হয়
তার পরেই আক্ষেপ হয় পুরুষ হ'য়ে জন্মানোর জন্য
কেননা পুরুষ কিছুই পবিত্র রাখে না

তেইশ

আমি এখন কবিতা লিখব
আমার তেষ্টা পাচ্ছে
ঘরে জল নেই
আমি এখন কবিতা লিখব
আমার খিদে পাচ্ছে
ঘরে খাবার নেই
আমি এখন কবিতা লিখব
আমার ঘুম পাচ্ছে
আমার বিশ্রাম প্রয়োজন
সময় নেই সময় নেই
আমি এখন কবিতা লিখব
কবিতাই আমার মদ ও রুটি
কবিতাই আমার যুদ্ধ ও শান্তি

চব্বিশ

একটা কবিতা যদি কোথাও নিয়ে না যায়
তাহ'লে সেটা কবিতাই নয়
একটা কবিতা পড়লে চাঁদ তারা জোনাকী
ঘরের দেওয়াল
তোমার মুখ
সব ঝকঝকে হ'য়ে যায়
বিষণ্ণও

পঁচিশ

বিলাপ রস

এক একটা কবিতা পড়লে
টানটান হয়ে উঠতো শরীর
গনগন করে উঠতো উনুনের আঁচ
গান বেজে উঠতো জ্বলন্ত রাঁধুনির গলায়

এখন আর তেমন মাছ কই
খানি নয়
চকোলেট টুকরো ভাসে
ঝোলের বাটিতে

ছাব্বিশ

ছুটি
আমার চাই অখণ্ড নিশ্ছিদ্র ছুটি
আর একজোড়া নর্থস্টার কেড্‌স্‌
যাতে আমি দুরন্ত ছুটে যেতে পারি
কবিতার দিকে

সাতাশ

দু-একটা তেমন কবিতা লিখতে পারলে
বদলে যায় দৃশ্যপট
যাতে ন্যুব্জ প্রৌঢ়া গৃহিণীকে মনে হয় মহীয়সী
প্রাত্যহিক ডালে ভাতে অমৃতের স্বাদ

লিখতে না পারলেও ক্ষতি নেই
কেউ না কেউ লিখছেই কোথাও
শুধু খুলে রাখা দরোজা জানালা
চোখ কান
মন

আটাশ

প্রদীপের নিচেই যতো অন্ধকার

তেল কালি

তা, তোর ওখানে যাওয়ার কি দরকার খালি খালি

বরং পাখা হলে উড়িস

এবং পড়তে চাস তো পড়িস

ঊনত্রিশ

সুন্দরের হাত ধরে সুন্দর এসেছে
সূর্যের প্রথম আলো মন্দির চূড়ায়
কুমারী স্তনের স্বপ্ন চোখে নির্ভয়ে জেগেছে কুমার
এখন কম্পাসহীন যে কোন সাগরে
ভেসে পড়া যায়

তিরিশ

দেরী হলেই বা কি ?
তাড়াতাড়ি ফিরে এলে
তুমি কি সময় পাবে ?
তোমারও তো দেরী হয়ে যায়

এবার কোথায় যাবে ? দার্জিলিং ?

বড়ো বেশী দেরী হয়ে গেল
পনের বছর আগে
টুটুন হঠাৎ না এসে পড়লে
সেবারই তো দার্জিলিং যাওয়া হত
এখন টুটুন
বড়ো বেশী ছটফটে
ওকে নিয়ে
পাহাড়ে সমুদ্রে যেতে ভয় করে

এ ভাবেই আমাদের দেরী হয়ে যায়

একত্রিশ

গম্ভীর চোখের কোন অনুবোধ নেই
পরিত্রাণ থাকে না আত্মসমর্পণ ছাড়া
তারপর   অজগর ফাঁস
সমস্ত জেনেও   কেউ কেউ
অপরাধী হয়ে থাকে আজীবন
            ল্যাম্পপোস্টের কাছে

বত্রিশ

তোমার সঙ্গে আমি
আমার সঙ্গে তুমি
কতদিন দেখা হয় না
কতদিন বসা হয় না একসঙ্গে
তোমার লাগানো গাছে
ফুল ফুটে ঝরে যায়
আমার সাজানো পুষ্পাধারে
মাকড়সার জাল—
তবুও কি সহজ রয়েছি
তুমি তোমার
আমি আমার
ভিন্ন অবস্থানে :
হঠাৎ চমকে দেখি
কবিতার মতো দিনগুলি থেকে
এখনও শব্দের ফুল
টুপটাপ ঝরে ঝরে পড়ে
স্মৃতির কবরে

তেত্রিশ

একটি নারীর জন্য যেভাবে উচ্ছন্নে যায় যুবা
তেমন আগুনে নেই নারীর স্বভাবে। তার
আছে অন্য কাজ। আগুনকে উনুনে বেঁধে
দু'চারটি সামান্য পদ রেঁধে সে অক্লেশে
তুলে ধরতে পারে সুধা বিশ্বক্ষুধার আর্তমুখে

চৌত্রিশ

তোমার কাছে বিদায় নিতে এসে মনে হ'ল ঃ
কার কাছে বিদায় নিয়ে কার কাছে যাবো
আমরা তো সবাই স্বর্গ থেকে বিতাড়িত
শয়তান আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে

আশ্চর্য তবুও আমরা ফুল ফোটাই গান গাই আর
আমাদের নিজস্ব স্বর্গ রচনার স্বপ্ন দেখি
এভাবেই প্রতিটি মানুষ
অন্তত একবারের জন্যও হয়ে ওঠে গোটা মানুষ লম্বা মানুষ
যার পায়ের পাতা ডুবে থাকে নরকের পাঁকে
আর মাথার সোনালী চুল
চুমু খায় সূর্যের ঠোঁটে

পঁয়ত্রিশ

আমার সব কথা তোমাকে বলবো ভেবেছিলাম
তোমার সঙ্গে দেখা হতেই তুমি বললে :
"আমার অনেক কথা আছে—"
"ঠিক কথা", "ঠিক কথা" ডাকতে ডাকতে
মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল বেনে বউ
আমরা যে যার কথা ভুলে
চেয়ে রইলাম দু'জনের মুখে

ছত্রিশ

ভোর হ'লে

প্রতিদিন পৃথিবীর কাছে আত্মসমর্পণের আগে

নিজেকে গুছিয়ে নিই

টুথব্রাস, সেফটি রেজার, খুবা আয়নার কাচ

সকলের কাছে আমি ঋণী

বাজারের থলিটার কাছে নতজানু হতে ইচ্ছা করে

সংবাদপত্রের ফিরিওলা, দুধ, পোস্টম্যান

ভীড় ট্রাম বাস

মুর্সাফল আসান আফগান ব্যাঙ্ক

সকলেই যেন দেবদূত

দেয়ালে লিখেছে যারা 'যুদ্ধ নয়' 'শান্তি চাই'

তাদের অদৃশ্য হাতে মনে মনে চুমু খেয়ে

নেমে পড়ি রুজির ধান্দায়

জানি, জানি

যে যারে ভালোবাসে সে তারে কাঁদায়

সাঁইত্রিশ

যদি বলি, খোলো   খুলবে
যদি বলি, তোলো   তুলবে
যদি বলি, দোলো   দুলবে
এই সব কবিতার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত
তারপর ভাষা শিক্ষা কারুকার্যময়
পুরস্কারের লোভে প্রাণপাত দৌড়

আটত্রিশ

তৃষ্ণা

শরীরটাই ভিখিরির মত পাঁচ দুয়ারে যায়
হাত পাতে   যেখানে যেটুকু পায়
কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনে
দুঃখের অন্নের আহার সুখ করে খায়
মনের মেটে না তৃষ্ণা
সারারাত শরীরটাকে আদুড় বানায়

উনচল্লিশ

প্রকৃতির কাননে আমরা এক একটি ফুল
আমরা যদি তেমনই না ফুটে থাকি
প্রকৃতি যেমন চায়
তা হ'লেই প্রজাপতি ফিরে যাবে
ছুটে আসবে ক্যানসার, এইডস্

চল্লিশ

কাছে পিঠে কোথাও যে যাবো তেমন সময় নেই
অথচ সবাই কেমন সহজে
টুকটাক
এদিক ওদিক চলে যায়
হায়
মন্দিরা যখন বলে : তুমি বলেছিলে পুরী নিয়ে যাবে
কপট নিদ্রায়
নিমগ্ন তখন আমি
মাঝরাতে চুপিচুপি নিদ্রিতার মুখ চেয়ে দেখি
দু'চোখের কোলে
জমে থাকা বঞ্চনার কালি
নিশ্চিন্তে ঘুমায়

একচল্লিশ

দেখেছি নৌকোর মতো নারী
বিবাহের বাঁধাঘাটে সেই যে ভিড়েছে এসে
আর তার নড়াচড়া নেই
জোয়ারের উন্মথিত ঢেউ
বারবার ঝাপ্টা মেরে
চিত্রার্পিত ফিরে গেছে সাগরের নীলে

বেয়াল্লিশ

"কাছে এলেই ভালোবাসবো"

"কাছে এলেই কথা শুনবো"

কিন্তু কেউ কাছে আসে না

পণপ্রথা চলতেই থাকে

ছেলের মা পরমা সুন্দরী কন্যা চায়

সমাজ ব্যবস্থা বদলায় না

আবার ভোট আসে

তেতাল্লিশ

ভাবতো শরীর শুধু

ভাষা—শাড়ি

ছন্দ—অলঙ্কার

শুধুই শরীর নিয়ে খেলতে চাও ?

খেলা অবশ্যই যায়,—খেলতেও পারো ;

কিন্তু সেই খেলা শুধুই মধুর ;

অধরা মাধুরী পেতে হ'লে—

পরাও ভাষার বালুচরী

সাজাও ছন্দের অলঙ্কারে

চুয়াল্লিশ

মধ্যদিন

কেউ এলে কি যে ভালো লাগে
পাশাপাশি চুপচাপ ব'সে থাকি গভীর নির্জন
কথা ব'লে ভাঙি না সময়
চ'লে গেলে···কথার ঝর্ণা নামে
একা একা নির্জন ঝর্ণার জলে পুণ্যস্নান

পঁয়তাল্লিশ

সকাল থেকেই পাখিদের গান
হাটে কোলাহল, ফুলে গুঞ্জন
সারা দিনমান কথায় কথায় প্রলাপ
তবুও অনেক কথা বুকের গভীরে
মুখের অনেক দূরে স্তব্ধ হ'য়ে থাকে
সব কথা বলা যায় না বলেই কবিতা

ছেচল্লিশ

প্রতিদিন
দু'চার লাইন
এভাবেই আজীবন
শুধু যাই কবিতার কাছে